আলোকপাত

ড. এ. কে. এনামুল হক

জ্বালানি তেল, বৈদেশিক মুদ্রা ও আমাদের নীতিমালা

জ্বালানির দাম বৃদ্ধি নিয়ে বাড়াবাড়ি চলছে বললে ভুল হবে না। তবে কে যে বাড়াবাড়িটি করছেন তা বোঝা যাচ্ছে না কিংবা বলতে পারেন কোথাও একটা লুকোচুরির খেলা চলছে। আর এ লুকোচুরির জালে পড়ে সরকার কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলেই কেন যেন আমার মনে হচ্ছে। বিষয়টি খোলাসা করতেই এ লেখা।

প্রথমত, জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর পেছনে প্রধান যুক্তি হলো বিশ্ববাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি। তেলের দাম বাড়লে আমদানি খরচ বাড়ে আর তাতে আমাদের মতো দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে টান পড়ে। তাই জ্বালানি তেলের ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার তাড়নায় দেশের বাজারে দাম বৃদ্ধি জরুরি। অর্থনীতির নিয়ম বলে দাম বাড়লে চাহিদা কমে তাই দাম বাড়লেই কেবল বৈদেশিক মুদ্রায় তার ভার কমবে।

দ্বিতীয়ত, জ্বালানি তেলের দামের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশের দামের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য থাকা উচিত। কারণ কোনো এক দেশের পণ্যের দাম তার প্রতিবেশী দেশের দামের চেয়ে কম হলে তা দেশ থেকে রফতানি হয় আর উল্টোটি হলে তা আমদানি করা হয়। আর সরকার তা করতে না দিলে বেসরকারি বা চোরাই পথে তা পাচার হয়।

তৃতীয়ত, জ্বালানি তেলে দাম সমন্বয় করা না হলে সরকারের কোষাগারে ভর্তুকির চাপ বাড়ে। বেশি দামে তেল আমদানি করে কম দামে বিক্রয় করলে মূল্যভেদ বাবদ পকেট কাটে। তাই ভর্তুকির চাপ কমাতে গিয়ে সরকারের দাম সমন্বয় করতেই হয়। এ পর্যন্ত সব বক্তব্যই আমাদের বইয়ের পাতার মতো। সরকারি সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি যথেষ্ট। অন্তত তাই মনে হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের পর বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়তে থাকে। তেলের দুটি বাজার রয়েছে। একটিকে বলা হয় স্পট মার্কেট অর্থাৎ সরাসরি যে বাজারে পণ্য কেনাবেচা হয়, অন্যটি হলো আগাম বাজার বা ফিউচারস মার্কেট অর্থাৎ যেখানে ক্রেতারা তেল আগাম ক্রয় করে। সেখানে এখনই দাম দিয়ে কেনা হয় আগাম পণ্য, যা ৩ থেকে ১২ মাস পর পাওয়া যাবে। ব্রেন্ট ওয়েলের আগাম বাজার অনুযায়ী তেলের দাম ৯২ ডলার ব্যারেল থেকে বেড়ে ১২৮ ডলারে যায় জুলাই মাসে অর্থাৎ প্রায় ৪০ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধি পায়। তবে তা আবারো ৯২ ডলারে নেমে আসে আগস্ট মাসে। অন্যদিকে স্পট মার্কেট বা খোলাবাজারে তা ৯৪ ডলার থেকে মার্চে বেড়েছিল ১২৩ ডলারে আর তা এখন হয়েছে ৮৩ ডলার। এক বছর আগে এ তেলের দাম ছিল ৮৫ ডলারের মতো। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি বর্তমানে অনেকটাই কমেছে এবং তা অন্তত গত মার্চ মাস থেকেও কম। উপরন্তু এক বছর আগের চেয়েও কম। শুধু তাই নয়, ওপেক দেশগুলোর হিসাব মতে, ইউক্রেনে যুদ্ধের ফলে বিশ্বের অর্থনীতিতে যে মন্দা ভাব দেখা দিয়েছে তাতে জ্বালানি চাহিদা আরো কমে যাবে আর তাই দাম ৮০ ডলারের ওপর ধরে রাখার জন্য তারা যুক্তরাষ্ট্রের আবেদন সত্ত্বেও বাজারে তেলের দৈনিক সরবরাহ কমিয়েছে।

তেলের বাজারে তিন ধরনের দাম রয়েছে। একটি খোলাবাজারের দাম বা স্পট মার্কেটের দাম। দ্বিতীয়টি আগাম বাজারের দাম বা ফিউচার মার্কেটের দাম, যা সাধারণত ১২ মাস পরে তেলের সরবরাহের জন্য অগ্রিম দাম। আর তৃতীয়টি হচ্ছে যেকোনো দুই দেশের মধ্যকার নির্ধারিত দাম। এর মধ্যে অগ্রিম বাজারে দাম সাধারণত অনেকটা স্টক মার্কেটের মতো অধিক চাপে থাকে। পান থেকে চুন খসলেই এ দাম বাড়ে বা কমে। যেই যুদ্ধের দামামা বাজল সঙ্গে সঙ্গেই অগ্রিম বাজারে দামে বেড়ে যায়। যুদ্ধের সমাপ্তিতা হচ্ছে তখনই আবার দ্রুত অগ্রিম বাজারে দাম পড়ে যায়। বাংলাদেশ অবশ্য এ ধরনের বাজার থেকে তেল কেনে না। তাই অগ্রিম বাজারে দাম বাড়া বা কমার সঙ্গে আমাদের আমদানীকৃত তেলের দামে কোনো সম্পর্ক থাকে না। অথচ পত্রিকা কিংবা টেলিভিশনে যখন দামের ঊর্ধ্ব বা নিম্নগতির সংবাদ আসে তখন অনেকটাই তা এ বাজারভিত্তিক সংবাদ। এর সঙ্গে পশ্চিমা বাজারের সম্পর্ক ব্যাপক। কিন্তু আমাদের নয়।

অনুরূপের মতো তেলের অগ্রিম বাজারের মূল্যের সঙ্গে হা-হুতাশ কিংবা সেসব সংবাদকে বড় করে প্রকাশ করলে তাতে অনেক নীতিপ্রণেতার অন্তর কেঁপে যায়। বাস্তবে আমাদের ক্ষেত্রে ইউক্রেন যুদ্ধের আগে কিংবা পরে তেলের দামে কোনো পার্থক্য নেই। অথচ গত ৫ আগস্ট সরকার ডিজেলের দাম ৪৩ শতাংশ এবং অকটেনের দাম প্রায় ৫১ শতাংশ বাড়িয়েছে। তাই জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধিতে সরকারের প্রথম যুক্তি সম্পূর্ণ অচল। তবে কি অন্য কোনো যুক্তি রয়েছে?

ভারতের তেলের বাজার বহুদিন যাবৎ খোলাবাজার নীতিতে নির্ভর করে চলছে। তাই তাদের দাম নিয়ত ওঠানামা করে। সে সঙ্গে রাজ্যভেদে দামের পার্থক্যও রয়েছে। সেক্ষেত্রে আমাদের বাজারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ কিংবা আসামের তেলের দামে তুলনা চলে। আসাম যেহেতু তেল উৎপাদনকারী রাজ্য তাই সেখানে দাম সাধারণত কম থাকে। প্রাপ্ত তথ্যমতে ভারতের কলকাতায় দাম ১০৬ রুপি বা ১২৬ টাকা আর আসামে তা বাংলাদেশী টাকায় ১১৪ টাকা। অর্থাৎ দ্বিতীয় যুক্তি সত্যি হলে এখন ভারত থেকে তেল বাংলাদেশে পাচার হওয়ার কথা। কিন্তু কই, আমরা তো এখন ভারত থেকে বাংলাদেশে তেল পাচার হতে দেখছি না! তবে কি ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা বেশি দক্ষ কিংবা বেশি দেশপ্রেমিক?

তৃতীয় যুক্তি ছিল, দেশের বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডারের ওপর চাপ। আমদানি মূল্য বেড়ে যাওয়ায় আমাদের মূল্যবৃদ্ধি করতে হয়। তাতে পণ্যের চাহিদা হ্রাস পায়। তাই দাম বাড়িয়ে চাপ কমাতে চাওয়াটা স্বাভাবিক। বেশ কিছুদিন যাবৎ আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার ক্রমাগত কমছে। তাতে সরকারের উচ্চ মহলে আতঙ্ক আশাটা স্বাভাবিক। প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের পতন কি তেলের কারণে হচ্ছে? বাজারমূল্যের যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাতে দিবি বুঝতে পারেন তেলের অতিরিক্ত আমদানি হয়নি কিংবা তেলের কারণে আমাদের ভাণ্ডারে টান পড়েনি। তাহলে কেন আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের অধঃগতি? কেউ না কেউ নিশ্চয় বৈদেশিক মুদ্রায় আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি করছেন?

এর পেছনে অনেক কারণ অনুমান করা যায়। প্রথমত বলতে পারেন আমদানি ব্যয়ের ঊর্ধ্বগতি। বাজারমূল্য বৃদ্ধির কারণে আমাদের আমদানীকৃত অনেক পণ্যের দাম বেড়েছে তাই আমদানি ব্যয় বেড়েছে। তবে আমাদের আমদানির অনেকাংশে আমাদের রফতানির ওপর নির্ভরশীল। আমাদের রফতানি আয়ও বেড়েছে। তাই কেবল আমদানির কারণেই যে বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার কমেছে তা বলা মুশকিল। দ্বিতীয় কারণ হলো,

> বার্তায় বলা হলো অর্থটা এসেছে আমার পারিশ্রমিক হিসেবে। কিন্তু আমার ব্যাংক আমার কাছে আরো তথ্য চাইল। চুক্তি চাইল। অর্থের প্রেরক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যার সদস্য বাংলাদেশ সরকারও। তার অর্থ গ্রহণ করতে এত প্রশ্ন অবান্তর। আমিও প্রস্তুত ছিলাম না এত প্রশ্নের জন্য। কারণ আমার ধারণায় বিদেশী আন্তর্জাতিক সংস্থার টাকা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অন্তত মানি লন্ডারিংয়ের প্রশ্ন ওঠে না। তাও যৎসামান্য অর্থ। সব তথ্য জোগাড় করার আগেই ব্যাংকটি টাকা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে সংস্থাটির অ্যাকাউন্টে

আমাদের দেশ থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ পাচার। অনিশ্চিত অর্থনীতিতে অনেকেই দেশে টাকা রাখতে নাও চাইতে পারেন। তাই যাদের বিদেশ থেকে আয় হয়, যেমন রফতানিকারক, আমদানিকারক তাদের অনেকেই টাকা বিদেশ পাঠিয়ে নিজেদের সম্পদ রক্ষায় ব্রতী হতে পারেন। দেশের যেকোনো অনিশ্চয়তায় এটাই স্বাভাবিক, তাদের অনেকেই হয়তো টাকা দেশেই আনছেন না। তৃতীয়ত, খোলাবাজারে বা কার্ব মার্কেটে ডলারের দামের ব্যাপক বৃদ্ধি বলছে ডলারের চাহিদা বেড়েছে। একই সঙ্গে বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থের পরিমাণ কমেছে। তাতে অনুমান করা যায়, টাকা আসছে বা যাচ্ছে তৃতীয় পথে। তাতে প্রকৃত অর্থে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার জোগানও কমেছে। একই সঙ্গে হুন্ডি ব্যবসায়ীদের ব্যবসা রমরমা। তারা এ ডলার কিনছে মাকপথে? অনেকেই সন্দেহ করছেন বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী ব্যবসায়ীর কার্যালয় কিংবা বিদেশে স্থানান্তরিত বাংলাদেশী কোম্পানি কিংবা বিদেশে অবস্থানরত দেশীয় আমলাদের স্ত্রী-পরিজন কিংবা রাজনীতিকদের পরিবারকে। তাদের সে দেশে থাকার জন্য যে টাকার দরকার তার জোগান যাচ্ছে হুন্ডি ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। আবার দেশে অবস্থানরত বিদেশী কোম্পানিগুলোও তার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। অনেক কোম্পানি দেশে কর ফাঁকিতে বাংলাদেশে অভিযুক্ত। তাই চোরাইপথে তাদের টাকা পাচারের যুক্তি উড়িয়ে দেয়া যায় না।

তবে আরো একটি কারণে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার কমে থাকতে পারে। বিশ্বের বহু দেশের মুদ্রা ডলারের বিপরীতে মূল্য হারাচ্ছে। এর মূলে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ডলার ছাপিয়ে ব্যয় নির্বাহের চেষ্টা ও একই সঙ্গে সেই দেশে সুদের হার বৃদ্ধি। ফলে অনেক দেশই তাদের মুদ্রার মান হারিয়েছে। বহুদিন যাবৎ একমাত্র বাংলাদেশই তা করতে দেয়নি। কী করে সম্ভব হলো? সহজ উত্তর হলো আমরা ডলারের ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে নিজেদের বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার থেকে ডলার বিক্রয় করে টাকার মান ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। কেন করেছি তা বোধগম্য নয়। কারণ টাকার মান ধরে রাখার ফলে আমাদের আমদানি বেড়েছে, ডলার পাচার বেড়েছে, পৃথিবীর অনেক দেশ তা করতে চাচ্ছিল বলে তাদের মুদ্রার মান কমেছে আর আমরা তা কমতে দিইনি বহুদিন যাবৎ। অর্থনৈতিকভাবে অচল এমন এক নীতি চালু করে আমরা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার হারিয়েছি। এখন যখন টান পড়েছে তখন হঠাৎ করেই যেন ধস নেমেছে। আঘাত এসেছে আমাদের মেরুদণ্ডে। সরকারের অনেকেই ভয় পেয়েছেন। ভাবছেন শ্রীলঙ্কার কথা।

বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের অধঃগতির কথা ভেবেই প্রায় আট-নয় মাসের আমদানি করার মতো অর্থ মজুদ থাকা সত্ত্বেও সরকার হাত পেতেছে আইএমএফের কাছে। সরকারের এভাবে হাত পাতার কারণ কোনো প্রকল্প ব্যয় নয়। সরকার ডলার চাচ্ছে কারণ দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদের ঘাটতি হচ্ছে। সরকার তাই আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের কাছে বাজেট সহায়তা চাচ্ছে। অর্থাৎ মনে হচ্ছে সরকারের ব্যয় নির্বাহের প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হচ্ছে তাই ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা না থাকায় সরকার ঋণ করছে। অথচ অনেক অযৌক্তিক খরচ না কমিয়ে আমরা পদ্মা মিয়ার মতো ধুমধামে খরচ করার জন্য ঋণ করছি। কতটা যুক্তিসংগত এ ঋণ তা ভাবার বিষয়। সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, সরকার তার প্রিয় দুই সচিবের জন্য সরকারি বাড়ি তৈরিতে ৪০ কোটি টাকার বেশি খরচ করার প্রকল্প গ্রহণ করছে। এ রকম আরো অনেক প্রকল্প রয়েছে। এ সময় তা কি করা উচিত? সরকারের মূল সমস্যা অভ্যন্তরীণ অর্থ সংগ্রহ। আগেও বলেছি, মাত্র ৩০ লাখ করদাতার ওপর ভর করে এ দেশ চলতে পারে না। করদাতার সংখ্যা না বাড়ালে দেশের এ স্বল্পসংখ্যক করদাতার ওপর করের চাপ বাড়াতে হবে। তাতে অনেক দেশী কোম্পানি বা করদাতা বিদেশ পাড়ি দিতে পারেন বা দিচ্ছেও। সরকারি দলের নেতাদের পরিচালিত অনেক কোম্পানিই এখন দেশ ছাড়ছে বা ছেড়েছে। করহার বাড়িয়ে কর আয় বৃদ্ধি করার এ প্রচেষ্টা হবে বোকামি। সরকারের উচিত শিগগিরই করদাতার সংখ্যা বাড়ানো। করদাতার সংখ্যা বাড়ানোর কোনো দৃশ্যমান প্রচেষ্টা কিংবা সফলতা দেখাতে না পারলে শুধু যে দেশী কোম্পানি বিদেশে পাড়ি দেবে তা নয়, অনেক বিদেশী কোম্পানিও দেশ ছেড়ে চলে যাবে। অনেক ব্যক্তি করদাতাও দেশ ছেড়ে বিদেশে যাবে। কারণ তারা সবাই জানে বা আন্দাজ করতে পারে, করদাতা খুঁজে বের করতে ব্যর্থ সরকার বর্তমান করদাতার ওপর কর বাড়িয়েই নিজেদের রক্ষা করতে চেষ্টা করবে।

কেবল তা নয়, যেখানে অইএমএফের টাকা আনতে সরকারকে অনেক কঠিন শর্ত মানতে হবে সেখানে দেশে ডলার আনার পথ ক্রমাগত কঠিন হচ্ছে। কিছুদিন আগে ডলারের জোগান বাড়াতে সরকারের একটি ঘোষণা এসেছিল এই বলে, বিদেশ থেকে বাংলাদেশে অর্থ আনতে ফরম পূরণের বাধ্যবাধকতা শিথিল করা হয়েছে। তেবেছিলাম তাতে দেশে ডলার আসবে অতি সহজে। কিন্তু তাতেও গুড়ে বালি। কয়েকটি উদাহরণ দিই। এক, কিছুদিন আগে আমি নেপালে গিয়েছিলাম একটি কাজে। সেখানকার কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে একটি সুইফট ট্রান্সফারের বার্তা আসে আমার ব্যাংকে। সুইফটে ডলারের বার্তায় বলা হলো অর্থটা এসেছে আমার পারিশ্রমিক হিসেবে। কিন্তু আমার ব্যাংক আমার কাছে আরো তথ্য চাইল। চুক্তি চাইল। অর্থের প্রেরক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যার সদস্য বাংলাদেশ সরকারও। তার অর্থ গ্রহণ করতে এত প্রশ্ন অবান্তর। আমিও প্রস্তুত ছিলাম না এত প্রশ্নের জন্য। কারণ আমার ধারণায় বিদেশী আন্তর্জাতিক সংস্থার টাকা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অন্তত মানি লন্ডারিংয়ের প্রশ্ন ওঠে না। তাও যৎসামান্য অর্থ। সব তথ্য জোগাড় করার আগেই ব্যাংকটি টাকা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে সংস্থাটির অ্যাকাউন্টে। দুই, আমার ছেলে বিদেশে রয়েছে। সে তার মাকে টাকা পাঠাতে চায়। অভিজ্ঞতার আলোকে বললাম, তুমি টাকা পাঠালে আমাকে যত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তার চেয়ে টাকা তোমার কাছে রাখাই সহজ। দরকার নেই। তিন, আমার ছেলে যে দেশে যে কোম্পানিতে চাকরি করে তাদের আইন অনুযায়ী সে যদি কোনো অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানে অর্থ দান করে তবে সমপরিমাণ অর্থ তার কোম্পানিও একই প্রতিষ্ঠানকে দান করবে। এ দানে তার করভার কিছুটা কমবে। বলল কোথায় পাঠাব? আমি বললাম সে দেশেই কোনো প্রতিষ্ঠানে দাও। কী কারণ? আমাদের দেশের কোনো প্রতিষ্ঠানকে বিদেশী অর্থ গ্রহণ করতে হলে যে পরিমাণ কাগজ ও দলিল-দস্তাবেজ দাখিল করতে হবে তাতে টাকার পরিমাণের চেয়ে হয়রানির পরিমাণ বেশি হবে। তোমার অর্থ তখন তাদের কাছে অনর্থ মনে হবে। বলাবাহুল্য সব ক্ষেত্রেই ডলারের পরিমাণ সামান্য। বুঝতেই পারছেন দেশের নিয়ম-কানুন দেশে ডলার আনতে আমাদের মতো লোককেও নিরুৎসাহিত করে।

বিষয়গুলো নিয়ে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন কিংবা এমনও হতে পারে, খোদ বাংলাদেশ ব্যাংকই চাচ্ছে না যেন আমরা বিদেশ থেকে সহজে ডলার দেশে আনি। সরকারের উচিত নীতি প্রণয়নে দেশের স্বার্থ ভেবে কাজ করা কেবল বিদেশীদের উপদেশ গ্রহণ করা নয়।

ড. এ. কে. এনামুল হক : অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ও পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট